ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Special Issue, April, 2026, Page No. 20-27
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.specialissue.W.430

‘কাঁটাচুয়া’: কল্পবিজ্ঞান কাহিনির মোড়কে ক্রমবর্ধমান ধর্ষণ ও লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে নারীর প্রতিরক্ষামূলক অভিযোজন এবং যুগের নিরিখে প্রাসঙ্গিকতা

সুমনা পাল, *রাজ্য সাহায্য প্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, যোগোদা সৎসঙ্গ পালপাড়া মহাবিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 01.04.2026; Accepted: 07.04.2026; Available online: 10.04.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Oppression and derision of women exist in every era and every society. Gautama's wife Ahalya was no exception from it, nor was revered mother-goddesses Tulsi Devi. This inhuman behaviour has been escalating with time. One still has not forgotten the brutal gang-rape of ‘Nirbhaya.

This sexual helplessness of women is a bare truth of human society. Images of this helplessness have repeatedly arisen in world literature-cinema-media in various ways. Bengali literature-cinema-media are no exceptions.

Rabindranath Tagore, in his novel Yogayog, has shown the cruelty of inhumane oppression of marital rape. In Mahasweta Devi's Draupadi, a tribal-woman rises in naked rebellion against gang-rape. When a woman burns with the fire of justice, no law, court, or police intervention is needed. Woman herself becomes her own weapon.

This very message is powerfully conveyed in Bani Basu’s story Kāṇṭācuyā, adding an unparalleled milestone in modern Bengali literature. Tense with suspense, apparently a thriller, by the end of which we realize it is written based on science fiction. In the environment, there are quite a few species that adapt to protect themselves. For example, the colour-changing ability of the chameleon, the snake’s ability to produce poison, etc. The author has portrayed how, like such animals, the female body adapts to protect itself. At the end of the story, readers too are compelled to wonder: Is such an incident possible? If it is, where? Hence, the relevance and urgency of Kāṇṭācuyā in the current context, form the introduction to my research paper.

Keywords: Science fiction, Rape, Assault, protest, Kantacuya (one type of mammal), Self-Preserving Adaptation

(১)

সাহিত্য জীবনের দর্পণ। আর তারই একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হল ‘Science-Fiction’ বা কল্পবিজ্ঞান কাহিনি। মানব সভ্যতা মধ্যযুগীয় কুসংস্কারের বেড়া-জাল পেরিয়ে আধুনিক যুগের চৌকাঠে পা রাখার সময় এক যুগান্তকারী বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের সূত্রপাত ঘটে। এই বিপ্লবের স্ফুরণে বদলে যায় মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবন-

চেতনা। অন্ধবিশ্বাস ও আবেগকে সরিয়ে জায়গা করে নেয় যুক্তিনিষ্ঠ বিজ্ঞানমনস্ক চিন্তাভাবনা। শুরু হয় বিশুদ্ধ বিজ্ঞান চর্চা। আমূল পরিবর্তন আসে শিল্প-কলা-সাহিত্যে। এরই ফলশ্রুতিতে জন্ম নেয় 'সায়েন্স-ফিকশন' বা কল্পবিজ্ঞানের কাহিনি বা বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি।

১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত 'A Little Earnest Book Upon A Great Old Subject' নামক প্রবন্ধ-গ্রন্থে বিখ্যাত লেখক-সমালোচক এবং প্রকাশক 'উইলিয়াম উইলসন' 'Science Fiction' শব্দবন্ধটির সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন। গ্রন্থটির প্রকাশক ছিলেন Darton & Co.U.K.। পরবর্তীতে 'science fiction' -এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে 'কল্পবিজ্ঞান' শব্দের প্রথম প্রয়োগ করেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক অদ্রীশ বর্ধন; ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে 'আশ্চর্য' পত্রিকায় আবির্ভাব সংখ্যায়।

Science-Fiction-এর Science শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ Scientia বা Scine থেকে; যার অর্থ জ্ঞান বা জানা। Fiction শব্দটি এসেছে Fictum বা Fictio থেকে; যার অর্থ রূপ দেওয়া, কল্পনা করা বা সৃষ্টি করা। বুৎপত্তিগত ভাবে বিচার করলে বলা যায়, বিজ্ঞানের বিষয়কে কেন্দ্র করে লেখক আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে যে রসসাহিত্য সৃষ্টি করেন তাই হল কল্পবিজ্ঞান সাহিত্য। সোজা হিসেবে কল্পবিজ্ঞানের গাণিতিক সমীকরণটা এরকমই দাঁড়ায়—

গল্প+বিজ্ঞান=কল্পবিজ্ঞান

বিজ্ঞানের চমকে দেওয়া আশ্চর্য সব সূত্র, তত্ত্ব এবং তথ্যের উপর ভিত্তি করে কল্পবিজ্ঞান পাড়ি দেয় অতল পাতালপুরী থেকে অনন্ত অন্তরীক্ষে। পাঠকের সামনে খুলে যায় অদ্ভুত এক রহস্যময় নতুন জগত। মনে হয়, এরকম কি আদৌ হওয়া সম্ভব? হ্যাঁ, কখনো কখনো সম্ভব। কারণ আজকের কল্পনা কালকের বাস্তব। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, বিখ্যাত কল্পবিজ্ঞান কাহিনিকার 'জুল ভার্ন' সমুদ্রের তলায় বিচরণ করার জন্য যে যন্ত্রযানের কল্পনা করেছিলেন, পরবর্তীতে তার সার্থক রূপায়ণ ঘটে সাবমেরিনের উদ্ভাবনে।

বিভিন্ন লেখক, গুণীজন, সাহিত্য-সমালোচক, গবেষক কল্পবিজ্ঞানকে নানাভাবে বুঝতে চেষ্টা করেছেন; বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। এই প্রসঙ্গে গবেষক সৌরভ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতামত উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি তাঁর 'বাংলা সাহিত্যে কল্পবিজ্ঞান' নামক গবেষণা গ্রন্থে লিখেছেন-

> "কল্পবিজ্ঞান বলতে আমরা বলতে পারি আধুনিক রূপকথা।... কল্প বিজ্ঞানের রূপকথা বিজ্ঞানভিত্তিক, তা বিজ্ঞানের সত্যকে ফুঁ দিয়ে ফাঁপিয়ে তোলা।... রূপকথায় যদি ঝাঁটায় চড়ে ডাইনি বুড়ির উড়ে বেড়ানোর কথা থাকে তবে কল্পবিজ্ঞানে পাই মহাকাশযানে চড়ে অন্তরীক্ষে পাড়ি দেওয়ার কথা। এজন্য একথা অবশ্যই বলা যেতে পারে যে, রূপকথা উপভোগ করতে গেলে বিজ্ঞানের কোন জ্ঞান না থাকলেও চলে, কিন্তু কল্পবিজ্ঞান উপভোগ করতে গেলে বিজ্ঞানের প্রাথমিক পাঠ অতি জরুরি। রূপকথার ব্যঙ্গমা-ব্যাঙ্গমি গল্প শোনায় আর কল্পবিজ্ঞানে গল্প শোনায় বিজ্ঞান।"[১]

তিনি আরও বলেন-

> "বিজ্ঞান শোনায় বাস্তব জগতের কাহিনি। কল্পবিজ্ঞানে থাকে কল্পনা ও বাস্তবের মেলবন্ধন। বস্তুত বিজ্ঞানের সঙ্গে সাহিত্যের কোন সম্পর্ক নেই কিন্তু কল্পবিজ্ঞানের সাথে সাহিত্য অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কারণ সাহিত্যসুলভ কল্পনার সঙ্গে বিজ্ঞানের সুত্রগুলির সংযোগের দরুণ গড়ে ওঠে কল্পবিজ্ঞান।"[২]

যাই হোক, রসসাহিত্য সাধারণত পার্থিব জীবনের প্রেক্ষাপটে জীবন ও জীবনের অনুভূতিগুলিকে তুলে ধরে। কিন্তু কল্পবিজ্ঞান সাহিত্য এই অসীম বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের (যার সীমা এবং স্বরূপ হয়তো কোনদিনই বোঝা

সম্ভবপর নয়) পরিপ্রেক্ষিতে যে কোন সময়কে, যে কোন প্রাণকে, যে কোন প্রাণের অনুভূতিকে তুলে ধরার ক্ষমতা রাখে। তাই কল্পবিজ্ঞানের ব্যাপ্তি ও ক্ষমতা সীমাহীন।

(২)

নারীর লাঞ্ছনা ও ধর্ষণ সব যুগে সব সমাজেই বিদ্যমান। বাদ পড়েননি গৌতম পত্নী অহল্যা, এমনকি মাতৃরূপে পুজিতা স্বয়ং তুলসী দেবীও। রামায়ণে অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে সীতা দেবীকে। রাক্ষস-রাজ রাবণের গৃহ থেকে উদ্ধার হওয়ার পর তাঁর চরিত্র নিয়ে উঠেছে হাজার প্রশ্ন। সতীত্বের পরীক্ষা দিতে জনসমক্ষে আগুনে প্রবেশ করতে বাধ্য হয়েছেন তিনি। কৌরব-সভায় চরম লাঞ্ছিত হয়েছিলেন দ্রৌপদী। বাইরের কেউ নয়, পরিবারের পুরুষেরাই এই কাণ্ড ঘটিয়েছিলেন। প্রকাশ্য রাজসভায় বাড়ির কুলবধূকে চুলের মুটি ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে এসে, তার পরনের কাপড় ধরে টানাটানি করার মতো যে বর্বর আচরণ কৌরবরা করেছিলেন তা ক্ষমার অযোগ্য।

এরকম আরও উদাহরণ রয়েছে ভুরি-ভুরি। যতই আমরা নারীর ক্ষমতায়নের কথা বলে গলা ফাটাই না কেন; এই ঘৃণ্য-অমানবিক আচরণ, দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে।

২০১২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর। কনকনে শীতের রাত। সেই অভিশপ্ত রাতে দিল্লির এক পর্দা-ঘেরা চলন্ত বাসে 'নির্ভয়া'র উপরে হওয়া নৃশংস অত্যাচার আমরা এখনো ভুলতে পারিনি। বিচারে অবশ্য অপরাধীদের ফাঁসি হয়। তবে নির্ভয়ার উপরে সবচেয়ে বেশি অত্যাচার চালিয়েছিল যে নাবালক, সেই কিন্তু বয়সের ফাঁক গলে পার পেয়ে যায়। পুলিশ সূত্রের খবর এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সহায়তায় এখন সে নাকি দক্ষিণ ভারতের একটি রেস্তোরায় চাকরি করছে। ভালোই কাটছে তার।

আমরা এখনও ভুলিনি কামদুনির সেই ছিন্নবিচ্ছিন্ন, দলা-পাকানো কলেজ পড়ুয়া তরুণীটিকে। ২০১৩ সালের ৭ই জুন, এক বৃষ্টি-ভেজা দুপুরে একা-একা বাড়ি ফিরছিল কলকাতার ডিরোজিও কলেজে পড়া দ্বিতীয়বর্ষের ছাত্রীটি। তার আর ফেরা হয়নি কোনদিন। মেয়েটির ক্ষতবিক্ষত শরীর পাওয়া যায় একটি নির্জন ধান-খেতে। নির্যাতিতার পরিবার ও আন্দোলনকারীরা সুবিচারের আশায় সুপ্রিমকোর্টে আজও লড়ে যাচ্ছেন।

নারীর এই যৌন অসহায়তা মানব সমাজের একটি চূড়ান্ত নগ্ন সত্য। সেই অসহায়তার ছবি পৃথিবীর সমস্ত ভাষার সাহিত্যে-শিল্পে-সিনেমায় বারবার উঠে এসেছে নানাভাবে। বাংলা সাহিত্য-শিল্প-সিনেমাও এর ব্যতিক্রম নয়।

১৯২৯ সাল, প্রকাশিত হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'যোগাযোগ' উপন্যাস। এখানে রবীন্দ্রনাথ খুব সূক্ষ্ম ভাবে তুলে ধরলেন বৈবাহিক ধর্ষণের কদর্য রূপটি। দেখালেন পঙ্কিল দাম্পত্যের মধ্যে থেকেও এক নারীর উত্তরণের আপ্রাণ প্রয়াস।

এই প্রসঙ্গে আর একটি গল্পের কথা মনে পড়ছে। মহাশ্বেতা দেবীর লেখা 'দ্রৌপদী'। একজন নারী কীভাবে একাই মশাল হয়ে জ্বলতে পারে তার প্রমাণ এই গল্প। প্রত্যন্ত অঞ্চলের ২৭ বছর বয়সি বিধবা আদিবাসী রমণী দ্রৌপদি মেঝেন। পুলিশের খাতায় সে মোস্ট ওয়ান্টেড। ধরা পড়ার পর পুলিশ ব্যারাকেই চলে রাত-ভর গণধর্ষণ। এখানে রক্ষকই হয়ে ওঠে ভক্ষক। তবু ভেঙ্গে ফেলা যায়নি দ্রৌপদিকে। ক্ষত বিক্ষত দুটি স্তন, উরু আর যোনি দেশে চাপ-চাপ রক্ত নিয়ে সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় উঠে দাঁড়ায় সে। ছিঁড়ে ফেলে কাপড়। সূর্যের প্রখর আলো মেখে শিরদাঁড়াটি টান-টান করে আগুন-ঝরা চোখে পুলিশ বাহিনীর সামনে এসে দাঁড়ায়। মুখের রক্ত মাখা থুতু ফেলতে বেছে নেয় উচ্চপদস্থ উর্দিধারীর সাদা বুশ-শার্ট। সুতীক্ষ্ণ গলায় বলে-

"হেথা কেও পুরুষ নাই যে লাজ করব। কাপড় মোরে পরাতে দিব না। আর কি করবি? লেঃ কাঁউটার ক্, লেঃ কাঁউটার কর_?"[৩]

এই প্রথম সেনানায়ককে নিরস্ত্র টার্গেটের সামনে ভয় পেতে দেখা যায়। ভীষণ ভয়। জঙ্গল মহলের তেজস্বিনী নারী 'দোপদি মেঝেন' একাই এই গল্পে বিরাশি সিক্কার থাপ্পড়টি মারেন বিকারগ্রস্ত প্রশাসনের গালে, ক্ষমতার গালে, রাষ্ট্রের গালে। আসলে বুকে যখন আগুন জ্বলে, তখন বোধ হয় আইন-আদালত-পুলিশ কোনো কিছুরই প্রয়োজন পড়ে না। নারী নিজেই নিজের অস্ত্র হয়ে ওঠে।

(৩)

প্রতিবাদ নানা ভাবে হতে পারে; কখনো মানসিক, কখনো শারীরিক। কখনো একক, কখনো জোটবদ্ধ। কখনো নিঃশব্দে, কখনো সরবে। প্রতিবাদ যখন তীব্র জমাট বাঁধে, তা হয়ে যায় প্রতিরোধ।

তীব্র অস্তিত্বের সংকটে ভোগা জীব বাঁচার তাগিদে বদলে ফেলে তার প্রতিরোধের ধরন। তখন শুধু শরীর-মন নয়, বদলে যায় তার DNA-এর গঠন। এক্ষেত্রে 'কাঁটাচুয়া' গল্পটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। লিখেছেন বাণী বসু।

কাঁটাচুয়া বা Hedgehog একপ্রকারের স্তন্যপায়ী প্রাণী যা এরিনাসিওমর্ফা (Erinaceomorpha) বর্গের এরিনাসি (Erinaceidae) পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। বাংলা-ভূখণ্ডের বিভিন্ন স্থানে এরা 'কাঁটাপোক' বা 'কাঁটা-শূকর' নামেও পরিচিত। সচরাচর এদের ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা মহাদেশে দেখতে পাওয়া যায়। প্রাণীটি মূলত নিশাচর এবং একা থাকতে বেশি পছন্দ করে। প্রধানত পতঙ্গভুক হলেও এরা কেঁচো, ছোট ব্যাঙ আবার কখনো কখনো গাছের ফলমূলও খায়। সারা দেহ (মুখ বাদে) শজারুর মতো তীক্ষ্ণ কাঁটায় আবৃত এবং বিপদ বুঝলে এরা শরীরকে গুটিয়ে গোল বলের মতো আকার দেয়। উত্তেজনার সময় কাঁটাগুলি হয়ে ওঠে ভীষণ বিপজ্জনক। কাঁটাচুয়ার সঙ্গে শজারুর আকৃতিগত মিল থাকলেও তা চেহারায় শজারুর তুলনায় অনেকটা ছোট। সাধারণত এদের শরীর আট থেকে বারো ইঞ্চি লম্বা হয়। এই কাঁটাচুয়া নামের প্রাণীটিকে সামনে রেখে লেখিকা থ্রিলারধর্মী কল্পবিজ্ঞান কাহিনির মোড়কে সৃষ্টি করলেন নারীর প্রতিরোধের সম্ভাব্য অভিযোজিত রূপ।

(৪)

রাজ্যে একটার পর একটা অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে চলেছে। আশ্চর্যের ব্যাপার শুধুমাত্র পুরুষের ক্ষেত্রেই এমন ঘটনা ঘটছে। অর্ধমৃত অবস্থায় কলকাতা শহরের ইএম বাইপাস থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ধনী পরিবারের বখাটে ছেলে আদিত্য আগরওয়ালকে। বয়স তার বাইশ-তেইশের আশেপাশে। ময়দান থেকে পাওয়া গেছে রক্তাক্ত অনুভব ভট্টাচার্যকে। হসপিটালে নিয়ে যেতে না যেতেই মৃত্যু হয়েছে তাদের। গহরাশোল গ্রামের পঞ্চাশোর্ধ্ব কামরান আলিকে পাওয়া গেছে বিশাল ধান খেতের মাঝে। বুক থেকে নাভি, নাভি থেকে নিম্নাঙ্গ সব জায়গাতেই তার অজস্র ফুটো। আর জামাইডোবা গ্রামের কার্তিক পাল নামের এক ব্যাক্তিকে লোকজন খুঁজে পেয়েছে মেলার মাঠের পাশ থেকে। তাকে নাকি মৃত্যুর আগে 'কাঁটাচুয়া-কাঁটাচুয়া' বলে চিৎকার করতে শোনা গেছে।

এতদিন ক্ষত-বিক্ষত মানুষগুলিকে পাওয়া যাচ্ছিল শুনশান মাঠে-খেতে, নির্জন বাইপাশে, অন্ধকারাচ্ছন্ন ময়দানে। এবার বিপদ এসে পড়ল একেবারে বাড়ির উঠোনে। একদিন সন্ধ্যেবেলা বন্ধু কানাই মাঝির বাড়ি গেল গগন পাড়ুই। কানাই তখন ঘরে নেই। কানাই-এর বউ রাধার দেওয়া চা আর লেড়ো-বিস্কুট খেয়ে অন্ধকার কুয়োতলায় হাত ধুতে গিয়ে ঘটল অঘটন। তীব্র আতঙ্কে 'কাঁটাচুয়া-কাঁটাচুয়া' বলে চিৎকার করা গগন পাড়ুই-এর গগনভেদী রবে সকলে ছুটে এলেও শেষ রক্ষা হয়নি। এদিকে আবার বারাসাতে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী রুনার কোচিং-স্যার শশাঙ্কবাবুকেও একই অবস্থায় পাওয়া গেল নিজের ঘরে।

খবরে জানা গেল, ঠিক এমন ভাবে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্রচুর মানুষের মৃত্যু হয়েছে, আর তারা সকলেই পুরুষ। কেউ যেন অসংখ্য শজারুর কাঁটা বিঁধিয়ে দিয়েছে তাদের শরীরে। সমস্ত রকমের উন্নত ডাক্তারি-পরিসেবা ও প্রচেষ্টা চালানোর পরেও, একজনকেও বাঁচাতে পারা যায়নি। কাঁটার মতো অজ্ঞাত কিছুর আঘাতে মাত্রাতিরিক্ত রক্তক্ষরণই মৃত্যুর কারণ বলে পোস্টমর্টাম রিপোর্টে উল্লেখ করা হচ্ছে সবক্ষেত্রে। পুলিশও কোনোরকম সুরাহা করতে পারছে না। এতগুলো মৃত্যু, তবু ধরা পড়েনি একজনও খুনি। পাওয়া যায়নি কোনও অস্ত্র। হাতে আসেনি একটাও সূত্র। দেশ জুড়ে আতঙ্কের আর সীমা নেই।

শেষে ড: জহর দাশের সুন্দরী, উচ্চশিক্ষিতা, সাংবাদিক-কন্যা নন্দনা দাশ নিজে-নিজেই এই ঘটনার রহস্য ভেদ করতে এগিয়ে আসে। দেখা করে শশাঙ্কবাবুর ছাত্রী রুনা আর কানাই মাঝির স্ত্রী রাধার সাথে। কারণ একমাত্র এরা দুজন শশাঙ্কবাবু আর গগন পাড়ুই-এর মৃত্যুর ঘটনায় অন্যতম প্রত্যক্ষদর্শী। রাধা আর রুনা দুজনেই জানায় ঘটনার সময় অস্বাভাবিক এক বুনো-জান্তব গন্ধে ভরে গিয়েছিল চারদিক। সারা শরীর জুড়ে তাদের কেমন একটা অদ্ভুত অনুভূতি হয়েছিল। কেমন একটা গা গুলিয়ে ওঠা, বমি বমি ভাব। তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থা। আর শেষ পর্যন্ত দুজনেই নাকি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। রাধা বলে—

> "...তখন আমার কী গা বিড়োচ্ছে, বাপরে...। হঠাৎ কেমন যেন সব ঘুলিয়ে উঠল। ভীষণ বমি পাচ্ছে, চোখে আঁধার দেখছি, শরীরটা কেমন করছে..."[৪]

সেই সাথে রাধা আরও জানায়, মৃত্যুর আগে গগন পাড়ুই তার দিকে তাকিয়ে 'কাঁটাচুয়া', 'কাঁটাচুয়া' বলে ভয়ঙ্কর চিৎকার করে উঠেছিল। কাঁটাচুয়ার খোঁজে পাড়াপড়শিরা লাঠি দিয়ে ঘর-বাহির সব লণ্ডভণ্ড করে ফেললেও কিছুরই দেখা পাওয়া যায়নি।

শুনে নন্দনার মাথায় তখন হাজার চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে। এমত অবস্থায় তার নিজের বাবা ড: দাশের ঠিক একই ভাবে মৃত্যু হল। ঘরে তখন ছিল, শুধুমাত্র কাজের মেয়ে জলি। তাকেও পাওয়া গেল অজ্ঞান অবস্থায়। বাড়ি ফিরে ঘরের মধ্যে নন্দনা পেল বুনো গন্ধ, যে গন্ধ রাধা আর রুনা পেয়েছিল। সে তখন দিশেহারা। ঘরে আর কেউ নেই, পিসতুতো দাদা অবনীশ ছাড়া। কিশোরী-বেলা থেকে এই পিসতুতো দাদাটিকে একেবারেই পছন্দ নয় নন্দনার। অথচ এই চূড়ান্ত মুহূর্তে সেই একমাত্র অবলম্বন। নির্জন ঘরে তখন শোকের বৃষ্টি নেমেছে। অথচ এর মধ্যেই হঠাৎ কেমন যেন বদলে গেল অবনীশের শরীরের ভাষা। লোভে চকচক করে উঠল চোখ। সান্ত্বনা দেওয়ার আছিলায় তার অবাধ্য হাত ঘুরে বেড়াতে লাগল নন্দনার শরীরের আনাচে-কানাচে। তারপর সুযোগ বুঝে কামার্ত শরীরটিকে মিশিয়ে দিতে চাইল নন্দনার শরীরে। এখানে লেখিকা একটি ভীষণ স্পর্শকাতর বর্ণনা দিয়েছেন-

> "সে (অবনীশ) হঠাৎ নিচু হয়ে ভেঙে পড়া নন্দনাকে জোর করে তুলে ধরল। গাঢ় গলায় বলল, তোর খুব কষ্ট হচ্ছে বাচ্চু? এই টপটা তুই খুলে ফ্যাল। নন্দনার টপের জিপার চড়াত করে খুলে গেল।
>
> .....তুই এই জিন্সটাও খোল.....তার গলা ধরে এসেছে। চোখ ধক ধক করছে .....অস্থির হাত এখন চলে যাচ্ছে প্যান্টের জিপারে। নিবিড় ভাবে তাকে জড়িয়ে ধরছে অবনীশ।... চকিতের মধ্যে তার বুকের মাঝে ঢুকে গেল অবনীশের ঠোঁট।"[৫]

শরীর জুড়ে তখন নন্দনার ভয়ঙ্কর অস্বস্তি। কী করবে সে এই অবস্থায়? আতঙ্কে ছটপটিয়ে উঠছে সদ্য পিতৃহারা মেয়েটি। মুহূর্তে নন্দনা অবাক হয়ে দেখল, আবার সারা ঘর ভরে যাচ্ছে সেই জান্তব-বুনো গন্ধে। কেমন যেন গা গুলিয়ে উঠছে তার, সাথে বমি বমি ভাব। তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থা। ভয় পাওয়া কাঁটাচুয়ার মতো গুটিয়ে যাচ্ছে তার শরীর। সমস্ত লোমকূপ ভেদ করে বেরিয়ে আসছে কাঁটার মতো দৃঢ় শলাকা। শরীর থেকে বেরিয়ে

আসা শলাকাগুলি গেঁথে যাচ্ছে অবনীশের সারা শরীরে। তীব্র যন্ত্রণায় আর আতঙ্কে নীল হয়ে যাচ্ছে কামার্ত নারী শিকারিটি। অবাধ্য রক্ত-স্রোত সহস্রধারায় বেরিয়ে আসছে, ভেসে যাচ্ছে অবনীশের সারা শরীর। মাত্র ২-৪ মিনিটের ব্যাপার। তারপর সেই সূঁচের মতো তীক্ষ্ণ শলাকাগুলো কোথায় যে লোমকূপের তলায় আবার লুকিয়ে গেল, নন্দনা বুঝতেই পারল না। কেমন একটা ঘোর লাগা অবস্থা। চতুর্দিকে যেন ঘন কুয়াশার পর্দা সব কিছুকে ঢেকে রেখেছে। তারপর তার আর জ্ঞান নেই...

> "কী যেন? নন্দনার আর কিছুই মনে পড়ে না। সে কিছুই জানে না। গিরগিটি যখন রং বদলায়.....লাল, হলুদ, সবুজ,.....সে কি বুঝতে পারে? জানে? প্রকৃতি জানে। গিরগিটি জানে না।"[৬]

আত্মরক্ষার্থে নারী-শরীর কীভাবে নিজে থেকে প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারে, তা নিয়ে রচিত হয়েছে এই গল্পের কাহিনি। টানটান উত্তেজনায় ভরপুর, আপাতদৃষ্টিতে থ্রিলারধর্মী গল্পটির একেবারে শেষে গিয়ে আমরা বুঝতে পারি এটি আসলে কল্পবিজ্ঞানের উপরে ভিত্তি করে লেখা। অবিশ্বাস্য হলেও শুধুমাত্র কল্পবিজ্ঞানের গুণে এই গল্প বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠতে পেরেছে।

(৫)

জীবকুলে বেশকিছু প্রজাতির মধ্যে আত্মরক্ষার্থে অভিযোজন ক্ষমতা গড়ে উঠতে দেখা যায়। অভিযোজন এমন এক ধরনের প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে জীব নিজের অঙ্গসংস্থানিক, শারীরবৃত্তীয় এবং আচরণগত পরিবর্তন ঘটিয়ে পরিবেশে আপন অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করে। সোজা ভাষায় অভিযোজন হল জীবের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার প্রক্রিয়া। বিষয়টা একটু পরিষ্কার করে বলা যাক। গিরগিটির রং বদলে ফেলার কথা আমরা কমবেশি সকলেই জানি। আসলে প্রাণীটি যখন অস্তিত্বের সংকটে ভোগে তখনই এই ধরনের রং পরিবর্তন করে। গিরগিটির মতো 'অক্টোপাস' এবং 'ক্যাটলফিশ'ও বিপদে পড়লে শরীর এবং রঙের দ্রুত পরিবর্তন ঘটায়। দক্ষিণ আমেরিকার 'তামান্ডুয়া' নামের প্রাণী আত্মরক্ষার্থে ভয়ংকর দুর্গন্ধ ছড়ায়। এরকম 'স্কঙ্ক' নামের আরেকটি প্রাণী বিপদে পড়লে পায়ুপথ দিয়ে তীব্র দুর্গন্ধ ছড়ায়। বেশি ভয় পেলে এরা আবার এমন তীব্র রাসায়নিক স্প্রে ছড়ায় যা যেকোনো প্রাণীর চোখের পক্ষে তীব্র ব্যথাদায়ক এবং সাময়িক অন্ধত্বের কারণ হয়। আবার 'বম্বার্ডিয়ার বিটেল' নামের স্থলপোকা বিপদের গন্ধ পেলে শরীর থেকে একপ্রকার গরম, বিষাক্ত এবং দুর্গন্ধযুক্ত রাসায়নিক তরল স্প্রে করে নিজেদেরকে সুরক্ষিত করার চেষ্টা করে। এদের মধ্যে এই বিশেষ ক্ষমতা প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে গড়ে উঠেছে।

(৬)

লেখিকা বাণী বসু 'কাঁটাচুয়া' গল্পে কল্পবিজ্ঞানের মোড়কে এই সব প্রাণীদের মতোই ধর্ষণের বিরুদ্ধে নারীর প্রতিরোধ এবং প্রতিরক্ষামূলক ক্ষমতা অর্জনের কাল্পনিক রূপটি তুলে ধরলেন। সৃষ্টি করলেন এক ভিন্ন স্বাদের জীবন-আখ্যান।

ধর্ষণ সব ক্ষেত্রে নিতান্ত যৌনক্রিয়া নয়, কখনো-কখনো তা ক্ষমতা প্রদর্শন ও সম্পাদনের নির্মম প্রক্রিয়া, আবার কখনো নিষ্ফল আক্রোশের বহিঃপ্রকাশ। খুন হলে আমরা প্রতিবাদ করতে দ্বিধা করি না। অথচ ধর্ষণের ক্ষেত্রে ধর্ষিতা এবং তার পরিবার প্রকাশ্যে কথা বলতে অনেক সময় অস্বস্তি বোধ করেন। যাঁরা মুখ খুলতে চেষ্টা করেন তাঁদেরকে পড়তে হয় অনেক সামাজিক বাধা-নিষেধ, রাজনৈতিক চাপের মুখে। কখনো আবার নিজের পরিবারের মানুষজনই হয়ে ওঠে সবচেয়ে বড়ো শত্রু। আসলে আমাদের মনের মধ্যে লুকিয়ে থাকা হাজার বছরের যৌন-নৈতিকতার সংস্কার হয়তো এই দ্বিধার কারণ। তাই বিচারের বাণী, নীরবে নিভৃতে মুখ লুকিয়ে কাঁদে।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আকাশপ্রদীপ' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে' কবিতাটি উল্লেখ না করে পারছি না। অন্ধ কলু-বুড়ির উঠতি বয়সের নাতনিটিকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। চারিদিকে খোঁজ-খোঁজ রব। কোথায় গেল সে? হঠাৎ একদিন সকালবেলা চৌকিদারের মুখে শোনা গেল– "যৌবন তার দ'লে গেছে,জীবন গেছে চুকে।"[৭] পাড়ার কালো, সহজ-সরল মেয়েটি কি প্রতিকার পাবে? অন্ধ কলুবুড়ির কান্না কি বন্ধ হবে? উত্তরও পেলাম রবীন্দ্রনাথের লেখাতে..... "উপায় নাই রে, নাই প্রতিকার"[৮]। সমস্ত আকাশ জুড়ে ধ্বনিত হয়। না, সেই অন্ধ বুড়ির নাতনিটি সুবিচার পায়নি। দিল্লির নির্ভয়ারও বিচার পেতে সময় লেগেছিল সাত-সাতটা বছর। কামদুনি-মামলা এখনও সুপ্রিম কোর্টে ঝুলে রয়েছে। ঘরে-বাইরে, ট্রেনে-বাসে; পরিচিত-অপরিচিত, কাছের মানুষ-দূরের মানুষদের কাছ থেকে প্রতিনিয়ত যে হেনস্থার শিকার হতে হয় একটি নারী-শরীরকে, তা কহতব্য নয়। দিনের পর দিন এইসমস্ত অনভিপ্রেত ঘটনার সামনাসামনি করতে করতে মনে হয়; হ্যাঁ, বিপদে ভয়ার্ত নারী-শরীর থেকে বেরিয়ে আসুক শজারুর কাঁটার মতো দৃঢ় শলাকা। ক্ষতবিক্ষত করে দিক লাঞ্ছনাকারী অথবা ধর্ষককে। কামার্ত পুরুষ-শিকারি নিজেই হয়ে যাক শিকার। স্বাভাবিক দৃষ্টিতে এরকম হওয়া অসম্ভব। কিন্তু সুদূর ভবিষ্যতে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার আকুল ইচ্ছায় নারী-শরীর যদি এরকম কোনও অভিযোজন ক্ষমতা অর্জন করে? তাহলে? পৃথিবী থেকে হয়তো একদিন চিরতরে মুছে যাবে অত্যাচার, শ্লীলতাহানি এবং ধর্ষণের মতো ঘটনা। লেখিকার মতো আমরাও সেই সম্ভাবনার আশায় থাকলাম।

তথ্যসূত্র

[১] বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌরভ। বাংলা সাহিত্যে কল্পবিজ্ঞান। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১৯, পৃ. ২০।

[২] বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌরভ। বাংলা সাহিত্যে কল্পবিজ্ঞান। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১৯, পৃ. ২১।

[৩] দেবী, মহাশ্বেতা। মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্প সংকলন। ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, নিউ দিল্লি, ১৯৯৩, পৃ. ৩৯।

[৪] বসু, বাণী। কাঁটাচুয়া। *কল্পবিশ্ব, https://share.google/MtpyNlH6AB5Z3iL4T*। প্রবেশের তারিখ: ২২শে মার্চ ২০২৬।

[৫] বসু, বাণী। কাঁটাচুয়া। *কল্পবিশ্ব, https://share.google/MtpyNlH6AB5Z3iL4T*। প্রবেশের তারিখ: ২২শে মার্চ ২০২৬।

[৬] তদেব, প্রবেশের তারিখ ২২শে মার্চ ২০২৬।

[৭] ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। সঞ্চয়িতা। সাহিত্যম, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ৬০১।

[৮] তদেব, পৃ. ৬০১।

গ্রন্থপঞ্জি:

১) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। যোগাযোগ। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৩৬, কলকাতা।

২) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। সঞ্চয়িতা। সাহিত্যম, ২০০৩, কলকাতা, পৃ. ৫৯৯-৬০১।

৩) দেবী, মহাশ্বেতা। মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্প সংকলন। ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ১৯৯৩, নিউ দিল্লি, পৃ. ২৯-৩৯।

৪) বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌরভ। বাংলা সাহিত্যে কল্পবিজ্ঞান। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১৯, কলকাতা, পৃ. ১৬-২১।

৫) বসু, রাজশেখর। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস কৃত মহাভারত সারানুবাদ। এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৫৬, কলকাতা, পৃ. ১৩১-১৩৫।

৬) Cott, H. B. Adaptative coloration in Animals. Methuen, 1940, London, p. 330-335.

৭) Qumsiyeh, Mazin B. Mammals of the Holy Land. Textas Tech University Press, 1996, Texas, p. 64.

ওয়েবসাইট:

৮) দত্ত, এলিনা। "গণধর্ষণের পর দুই পা চিরে হত্যা! কামদুনির নৃশংসতায় শিউরে ওঠে বাংলা।" *এই সময়, https://eisamay.com*। প্রবেশের তারিখ: ২০ মার্চ, ২০২৬

৯) পিয়াল, জান্নাতুল নাইম। "দিল্লিতে চলন্ত বাসে গণধর্ষণ: যে ভয়াবহ অপরাধ নাড়িয়ে দিয়েছিল গোটা বিশ্বকে।" *roar media, https://archive.roar.media/bangla/main/world/2012-delhi-gang-rape*। প্রবেশের তারিখ: ২০ মার্চ, ২০২৬

১০) বসু, বাণী। "কাঁটাচুয়া"। *কল্পবিশ্ব, https://www.kalpabiswa.in/article/%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A7%81%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE/*, প্রবেশের তারিখ: ২২শে মার্চ, ২০২৬

১১) "Science Fiction-Origin & Meaning of the Phrase". Online Etymology Dictionary, https://www.Etymonline.com, 25th March, 2026.